আমার সত্যজিৎ

প্রদীপ দেব

১

২রা মে সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন। আমার খুব প্রিয় একটি দিন। ২৫শে বৈশাখ বললে যেমন দিনটি সম্পর্কে আর কিছু না বললেও চলে, ২রা মে-ও আমার কাছে তেমনি। রবীন্দ্রনাথ প্রচার পছন্দ করতেন, উৎসব পছন্দ করতেন - নিজের জন্মদিনে নিজেকে নিয়ে উৎসবেও উৎসাহ ছিলো তাঁর। "চিরনূতনেরে দিল ডাক, পঁচিশে বৈশাখ"- তারই প্রমাণ। কিন্তু সত্যজিৎ রায় ব্যক্তিগত ব্যাপারে ছিলেন নিভৃতচারী। ঘটা করে তাঁর জন্মোৎসব করার কোন খবর আমার জানা নেই। কিন্তু আমি নিজে নিজে ২রা মে পালন করি। রবীন্দ্রজয়ন্তী যেমন রবীন্দ্রনাথ দিয়েই সারা হয় - আমার সত্যজিৎ উৎসবও হয় সেরকম। সেদিন আমি সত্যজিতের সিনেমা দেখি, পড়ি প্রফেসর শঙ্কু বা ফেলুদার কোন গল্প। বিশ্বব্যক্তিত্বের ওপর অধিকার জন্মায় সারা বিশ্বের - সে হিসেবে সত্যজিৎ রায়কে আমি 'আমার সত্যজিৎ' বলতেই পারি। এ লেখায় আমি আমার নিজস্ব অনুভবের সত্যজিৎ রায়কে প্রকাশ করছি।

সত্যজিৎ রায় (২ মে, ১৯২০ - ২৩ এপ্রিল, ১৯৯২)
ছবিঃ www.calcuttaweb.com

২

বাংলাদেশের অত্যন্ত প্রত্যন্ত একটি গ্রামে আমার জন্ম। ওখানেই আমার স্কুল - ওখানেই আমার বেড়ে ওঠা। শৈশব কৈশোরে সাংস্কৃতিক বিকাশ বলতে বুঝতাম স্কুলের বার্ষিক পুরষ্কার

বিতরণী সভা আর দুর্গাপূজায় দাদা কাকাদের গোঁফ কামিয়ে শাড়ি পরে সীতা মন্দাদরীর অভিনয়। আশির দশক পর্যন্ত আমাদের গ্রামে কোন টেলিভিশন ছিলো না। বিদ্যুৎ সংযোগ হয়েছে মাত্র সেদিন - নব্বই দশকে। আশির দশকের শুরুতেও সত্যজিৎ রায়ের নাম শুনিনি আমি।

স্কুল জীবনের শেষের বছরে মফস্বলের একটি স্কুলে উত্তরণ ঘটে আমার। নতুন স্কুলে এসে কুয়োর ব্যাঙ সাগরের পানিতে হাবুডুবু খেতে খেতে শুনলাম সহপাঠীরা মাঝে মাঝেই ছড়া কাটে - ''লেখাপড়া করে যে, অনাহারে মরে সে'', ''জানার কোন শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই''। শুরুতে আমার মনে হলো এগুলো তাদের নিজেদের রচনা। অবশ্য তাদের প্রতিভায় পুরোপুরি মুগ্ধ হয়ে ওঠার আগেই স্কুলের লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়েছি। জেনে গেছি সত্যজিৎ রায়ের নাম।

৩

'বাক্স রহস্য' - আমার পড়া প্রথম সত্যজিৎ। তখন আমি কলেজে পড়ি। বাক্স রহস্য পড়েই আমি বুঝে ফেলেছি যে ফেলুদার জালে ধরা পড়ে গেছি আমি। এরপর সময় কেটে গেছে। প্রতিবছর 'দেশ' পূজাসংখ্যার জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম - সত্যজিৎ রায়ের নতুন গল্প পড়বো বলে। এখান থেকে ওখান থেকে যেভাবে পারি - সত্যজিৎ রায়ের বই জোগাড় করে পড়েছি। তখন ভারতীয় বই কিনতে হতো তিনগুণ সাড়ে তিনগুণ দাম দিয়ে। অত টাকা জোগাড় করা সম্ভব হতো না আমার। চট্টগ্রামের স্টেশান রোডে 'অমর বই ঘর' নামে একটি পুরনো বইয়ের দোকান থেকে ঘেঁটে ঘেঁটে বের করেছি সত্যজিৎ রায়ের অনেক বই। পরে দিদি চাকরি পাবার পরে আমাকে আর ভাবতে হয়নি - সে-ই কিনে দিয়েছে সত্যজিৎ - কিনে দিয়েছে 'দেশ' প্রতিবছর।

তারপর একে একে পড়া হয়ে গেছে - বাদশাহী আংটি, গ্যাংটকে গন্ডগোল, সোনার কেল্লা, কৈলাসে কেলেংকারি, রয়েল বেঙ্গাল রহস্য, জয় বাবা ফেলুনাথ, ফটিকচাঁদ (এই বইটি প্রথমবার পড়ে আমি কেঁদেছি। কেন কেঁদেছি - জানিনা।), গোরস্থানে সাবধান, ছিন্নমস্তার অভিশাপ, হত্যাপুরী, টিনটোরেটোর যীশু, ফেলুদা এন্ড কোং, নয়ন রহস্য, ডাবল ফেলুদা, দার্জিলিং জমজমাট, যত কান্ড কাঠমান্ডুতে, তারিনীখুড়োর কীর্তিকলাপ, পিকুর ডায়েরি ও অন্যান্য, এক ডজন গপ্পো, আরো এক ডজন, আরো বারো, একের পিঠে দুই, এবারো বারো, ব্রেজিলের কালো বাঘ, প্রফেসর শংকু, প্রফেসর শংকুর কান্ডকারখানা, স্বয়ং প্রফেসর শংকু, সাবাস প্রফেসর শংকু, মহাসংকটে শংকু, শংকু একাই একশো, যখন ছোট ছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ যতবারই পড়ি - ততোবারই নতুন মনে হয়। সেই একই অনুভূতি হয় সত্যজিৎ রায়ের ছোটগল্পগুলো পড়ার বেলাতেও। ফেলুদার গল্পগুলো অনেকদিন বিরতি না দিয়ে পড়লে বারবার পড়তে ইচ্ছে করে না - কারণ রহস্য উদঘাটিত হয়ে যাবার পরে রহস্য

গল্পের আবেদন কিছুটা বাসি হয়ে যায়। কিন্তু বারো সিরিজের গল্পগুলো চিরনতুন। সত্যজিৎ রায়ের পাঁচটি ছোটগল্পের বইয়ের পাঁচ ডজন গল্পই আমার প্রিয়।

প্রফেসর শংকুর গল্পগুলো পড়ার সময় আমার মনে যে শংকুর চেহারা ভেসে ওঠে তার সাথে সত্যজিতের আঁকা লম্বা দাড়িওয়ালা টেকো প্রফেসরের কোন মিল নেই। আমার কল্পনার প্রফেসর শংকুর চেহারা অনেকটা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মত। অবশ্য ইদানিং প্রফেসর শংকু পড়ার সময় প্রফেসর জাফর ইকবালের চেহারা ভেসে ওঠে।

ফেলুদার গল্পগুলো পড়ার সময় ফেলুদাকে কিছুতেই সৌমিত্রের মত মনে হয়না। সেজন্য ’জয় বাবা ফেলুনাথ’ ও ‘সোনার কেল্লা’ দেখার সময় গল্পের ফেলুদাকে খুব বেশি মিস করেছি।

৪

সত্যজিৎ রায় অনূদিত আর্থার কনান ডয়েলের ‘ব্রেজিলের কালো বাঘ’ পড়ার পরে আর্থার কনান ডয়েলের মূল গল্পটিও পড়েছি। মনে হয়েছে মূল গল্পের চেয়ে অনুবাদটি অনেক বেশি সুন্দর - অনেক বেশি টানটান। আমার দুর্বল ইংরেজি জ্ঞানের কারণেই হয়তো। মূল শার্লক হোম্‌স পড়ার পেছনেও কাজ করেছে সত্যজিতের ‘ব্রেজিলের কালো বাঘ’-এর অনুপ্রেরণা।

৫

‘পথের পাঁচালী’ দেখি সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পর। বিটিভিতে দেখানো হয়েছিলো সত্যজিৎ রায়ের স্মরণে। এর আগে ১৯৮৫তে সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে অনেকগুলো ভারতীয় বাংলাছবি দেখানো হলেও সত্যজিত রায়ের কোন ছবি দেখানো হয়নি। কেন জানিনা। ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা বিটিভির রামপুরা কেন্দ্র দেখতে গিয়েছিলাম। তখন সম্প্রচার পরিচালক কোরেশী সাহেবকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম - ‘আপনারা প্রতিদিন হলিউডের সিনেমা-সিরিয়াল দেখাতে পারেন, অথচ সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখান না, কেন?’ তিনি উত্তর দিয়েছিলেন - ‘‘সরকারের নিষেধ আছে’’।

আমার জানা মতে বিটিভি পরে সত্যজিতের আরেকটি সিনেমা দেখিয়েছে - সদ্‌গতি। হিন্দি ভাষায় নির্মিত এই স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমাটি দেখে শিউরে উঠেছি। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের যে মানুষ বলে মনে করে না - তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়।

৬

নব্বই এর দশকে ভিসিআর ও ভিডিও লাইব্রেরি সহজলভ্য হয়ে যাবার সুবাদে একে একে দেখা হয়ে যায় - সত্যজিতের অনেকগুলো ছবি। পরে কম্পিউটার, ভিসিডি ও ডিভিডি ইত্যাদির সংস্পর্শে আসার পরে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাগুলো আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে চলে আসে। তাঁর ‘চিড়িয়াখানা’ ছাড়া আর সবগুলো কাহিনীচিত্র আমি দেখেছি।

৭

১৯৫৫ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত মোট ২৯টি পূর্ণদৈর্ঘ কাহিনীচিত্র, দুটো স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র এবং পাঁচটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন সত্যজিৎ রায়। পূর্ণদৈর্ঘ কাহিনীচিত্রগুলো হলোঃ (১) পথের পাঁচালী (১৯৫৫), (২) অপরাজিত (১৯৫৬), (৩) জলসাঘর (১৯৫৮), (৪) পরশপাথর (১৯৫৮), (৫) অপুর সংসার (১৯৫৯), (৬) দেবী (১৯৬০), (৭) তিনকন্যা - পোস্টমাস্টার, মণিহার, সমাপ্তি (১৯৬১), (৮) কাঞ্চনজঙ্ঘা (১৯৬২), (৯) অভিযান (১৯৬২), (১০) মহানগর (১৯৬৩), (১১) চারুলতা (১৯৬৪), (১২) মহাপুরুষ (১৯৬৪), (১৩) কাপুরুষ (১৯৬৫), (১৪) নায়ক (১৯৬৬), (১৫) চিড়িয়াখানা (১৯৬৭), (১৬) গুপি গায়েন বাঘা বায়েন (১৯৬৮), (১৭) প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৭০), (১৮) অরণ্যের দিনরাত্রি (১৯৭০), (১৯) সীমাবদ্ধ (১৯৭১), (২০) অশনি সংকেত (১৯৭৩), (২১) সোনার কেল্লা (১৯৭৪), (২২) জন অরণ্য (১৯৭৪), (২৩) সতরঞ্জ কি খিলাড়ি (হিন্দি) (১৯৭৭), (২৪) জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৮), (২৫) হীরক রাজার দেশে (১৯৮০), (২৬) ঘরে বাইরে (১৯৮৪), (২৭) গণশত্রু (১৯৮৯), (২৮) শাখা প্রশাখা (১৯৯০), (২৯) আগন্তুক (১৯৯১)। স্বল্পদৈর্ঘ কাহিনীচিত্রগুলো হলোঃ (১) সদ্‌গতি (হিন্দি) (১৯৮১), (২) পিকু (১৯৮২)। তথ্যচিত্রঃ (১) রবীন্দ্রনাথ (১৯৬১), (২) সিকিম (১৯৭১), (৩) দি ইনার আই (১৯৭২), (৪) বালা (১৯৭৬), (৫) সুকুমার রায় (১৯৮৭)।

৮

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বিবেচনা করলে একজন শিল্পীর সবগুলো শিল্পকর্মই সমান ভালো হয়না বা সমানভাবে ভালো লাগে না সবার। সত্যজিৎ রায়ের সবগুলো সিনেমাই কালোত্তীর্ণ - তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারপরও কিছু কিছু ছবির ব্যাপারে ভালো লাগা মন্দলাগার কিছু ব্যাপার থাকে। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাগুলোতে কী কী ভালো লেগেছে বলার চেয়ে কী কী ভালো লাগেনি বলাটা আমার পক্ষে সহজ। কারণ ভালো লাগার তুলনায় ভালো না লাগার ব্যাপারটি একেবারেই নগণ্য।

গুপি গায়েন বাঘা বায়েন ও হীরক রাজার দেশে মূলত রূপকথা ভিত্তিক ছবি। তাই সেখানে অবাস্তব অনেক কিছুই ঘটে। ভূত, ভূতের রাজার বর, সেই বরে ভর করে অলৌকিক সব অভিযান দেখতে মন একটু খচ খচ করে। শিল্পের খাতিরেও অলৌকিকত্ব মেনে নিতে পারি না। ঠাকুরমার ঝুলি আমাদের আদি রূপকথার ঝাঁপি হলেও আমি তার প্রচার প্রয়োজনীয় মনে

করি না। হ্যারি পটার যতই জনপ্রিয় হোক, আমার ভালো লাগে না। সায়েন্স ফিকশানে যুক্তি থাকে, কিন্তু গুপি গায়েন বাঘা বায়েন - সেরকম কিছু না। হীরক রাজার দেশে - ছবিতে সামাজিক রাজনৈতিক জোরালো বক্তব্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বলার জন্য অলৌকিক ঘটনার দরকার ছিলো না। এরচেয়ে অনেক গভীর বক্তব্য সরাসরি বলেছেন সত্যজিৎ রায় তাঁর শেষের দিকের ছবিগুলোতে।

সোনার কেল্লা ও জয় বাবা ফেলুনাথে ফেলুদা হিসেবে সৌমিত্রকে মেনে নিতে পারিনি। বই পড়ার সময় ফেলুদার যে অবয়ব আমার মনে ভেসে উঠেছিলো তার সাথে সৌমিত্রের মিল নেই বলেই এরকম হয়েছে।

বাসায় সবার সাথে বসে 'ঘরে বাইরে' দেখতে গিয়ে কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েছি। সন্দ্বীপ (সৌমিত্র) ও বিমলার (স্বাতীলেখা) তিনটি চুম্বন দৃশ্য আছে ছবিতে। বাংলা সিনেমায় এরকম খোলামেলা চুম্বন দৃশ্য একেবারেই নতুন একটি ব্যাপার। সত্যজিৎ রায় বলেই কি সেন্সর বোর্ড ছুরি চালায় নি এখানে? জানিনা। তবে এখন আর সেরকম অস্বস্তি লাগে না। নানারকম চ্যানেলে এখন নানারকম খোলামেলা দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বাড়ির সবাই।

'শাখা প্রশাখা' দেখার সময় মনে হয়েছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক সম্পর্কে কিছু জানা থাকলে ছবিটি আরো উপভোগ্য হতো আমার কাছে। মিউজিক শুনেই যদি চিনতে পারতাম কোন্‌টি বাখ্‌ আর কোন্‌টি বেটোভেন তাহলে কতই না মজা পেতাম। সৌমিত্র, দীপংকর এর ছোটভাই এর চরিত্রে রঞ্জিৎ মল্লিককে খুব বেমানান মনে হয়েছে।

৯

সত্যজিতের ছবিগুলোকে ভালো লাগার ভিত্তিতে আমি তিনভাগে ভাগ করে নিয়েছি। তৃতীয় স্থানে আছে 'গণশত্রু' ও 'আগন্তুক' ছাড়া বাকি সবগুলো ছবি। দ্বিতীয় স্থানে 'গণশত্রু' আর সবচেয়ে ভালো লাগা ছবিটি হলো সত্যজিতের শেষ ছবি 'আগন্তুক'।

ধর্ম নিয়ে মন্দির নিয়ে ব্যবসার বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ 'গণশত্রু'। সামাজিক অবস্থার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে ছবিটিতে। ছবির সবচেয়ে পজিটিভ দিক হলো - নিশ্চিত পরাজয় জেনেও নীতির প্রশ্নে আপোস না করা, সাথে কেউ নেই জেনেও পিছু না হঠা। ছবিটি যতবারই দেখি - মনের ভেতর অন্যধরণের এক জোর পাই।

সত্যজিৎ রায়ের ছবিগুলোর মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগা ছবি 'আগন্তুক'। সত্যজিতের শেষ ছবি। আগন্তুক মনমোহনের (উৎপল দত্ত) মধ্যে আমি যেন সত্যজিৎ রায়ের ভাবনারই প্রতিফলন দেখতে পাই। প্রচলিত সাংগঠনিক ধর্ম সম্পর্কে সত্যজিৎ খোলাখুলিই বলেন এখানে, "যে ধর্ম মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে, তা মানা যায় না। অর্গানাইজড

রিলিজিয়ন তা করেই। তাই আমি ধর্ম মানি না”। আর এ ছবিতে সত্যজিৎ পরিষ্কার করে যা বলে গেছেন তা হলো, কূপমন্ডুক হতে নেই। ছবির শেষের দিকের দুটো সংলাপ এরকমঃ

- কী হবে না বলে কথা দিয়েছো?
- কূপমন্ডুক।

ছবিটা যতবার দেখি - ততোবার নিজেকে নিজে কথা দিই - কূপমন্ডুক হয়ে থাকবো না। আমি চেষ্টা করছি কথা রাখার।

---

১৯ মে, ২০০৬
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া